ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 120- 126
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.277

বাণী বসুর ছোটগল্প: মধ্যবিত্তের জীবন আলেখ্য

শান্তি দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bani Basu is one of the eminent fiction writers of the twentieth and twenty-first centuries. As accomplished works of art, her contemporary short stories are enriched by diverse life experiences. Globalization has brought changes in the standard of living of Bengalis. Parallel to these changes, there has been a transformation and evolution in Bengali thought. Bengali life experiences have found firm expression in narrative art.

The dynamic life of Kolkata, familiar to her since childhood, has been reflected in various ways in Bani Basu's sensibility. She has observed the impact of globalization on human life nourished by the soil and ethos of Kolkata. The irresistible obsession with the accumulation of wealth and the overwhelming attraction towards a life enriched by advertising affluence gradually engulf the Bengali middle class. They come to fix an ideal of an easily attainable lifestyle, where the foundation of values is worn and fragile. As the middle class moves from narrowness to increasing narrowness, it exiles itself to an island of loneliness. Even while surrounded by others, it carries the agony of solitude within its heart and at times is driven towards self-destruction. Yet, despite this, the Bengali middle class is not indifferent to life. In order to survive and preserve their existence, they continue to struggle for life. The short stories of Bani Basu become eloquent through their artistic depiction of this life narrative of the Bengali middle class.

In her stories such as Sujit–Mitu and Lakshmi's Panchali, Lakshmi's Resignation, Dadara, Haran–Prapti–Niruddesh, Bastu, Dhoya, and Lona, the portrayal of middle-class life makes a claim to uniqueness. In narrative style, selection of incidents, and exploration of the middle-class psyche, she maintains artistic integrity throughout. Believing that the short story is an art of its time and enriched by lived experience, her characters emerge from this conviction. All aspects of social existence receive profound respect in her writing.

Keywords: Bani Basu, middle class, Sujit–Mitu and Lakshmi's Panchali, Lakshmi's Resignation, Gyanpapi, Dadara, Haran–Prapti–Niruddesh, psychiatrist, Bastu, Jyotirmoyee Guha, Dhoya, Lona

বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর একজন বরেণ্য কথাকার বাণী বসু। সার্থক শিল্প হিসেবে তাঁর সমকালের ছোটগল্প বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বিশ্বায়ন বাঙালির জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনের সমান্তরালে বাঙালির ভাবের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। বাঙালির জীবন অভিজ্ঞতা কথাশিল্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আবাল্য পরিচিত কলকাতার চলমান জীবন বাণী বসুর অনুভূতিতে নানাভাবে ধরা পড়েছে। তিনি দেখেছেন কলকাতার ভূমিরসে পুষ্ট মানবজীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব। অপ্রতিরোধ্য বিত্ত সঞ্চয়ের নেশা ও বিজ্ঞাপনী প্রাচুর্যে

সমৃদ্ধ জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বাঙালি মধ্যবিত্তকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে। তারা সহজলভ্য জীবনযাত্রার একটা আদর্শমান স্থির করে। যেখানে মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি জরাজীর্ণ। মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে গিয়ে নিজেদেরকে একাকিত্বের দ্বীপে নির্বাসন দিচ্ছে। সবার মাঝে থেকেও একাকিত্বের যন্ত্রণা বুকে বহন করতে করতে কখনো আত্মহননে প্রবৃত্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনবিমুখ নয়। বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা জীবন সংগ্রাম করছে। এই বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকথার শৈল্পিক বর্ণনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে বাণী বসুর ছোটগল্প।

বারিদবরণ ঘোষ বাণী বসুর মানব জীবন পর্যবেক্ষণ ও তা গল্পে উপস্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন গল্পসমগ্রের তৃতীয় খন্ডের 'আস্বাদন' এ-

> "বাণী বসু জীবনকে দেখেন তার মোহমুগ্ধতায় ততখানি নয়, যতখানি দেখেন নির্মমতায়, আরও স্পষ্ট করে অর্থনীতি-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায়। সব সম্পর্ক ভাঙছে, চুরছে, কিন্তু তারই মধ্যে পায়ের নিচে জমিনের সন্ধানও রয়েছে।"[১]

বিশ্বায়ন শুধু মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে গ্রাস করেনি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সমান করেছে; স্বাধীন মানসিকতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দান করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য যেখানে ক্ষীণতর। মধ্যবিত্তের জীবনালেখ্যের ক্যানভাস বলা যায় মধ্যবিত্তের জীবন সংকটকে। যেখানে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। শুভলক্ষ্মী দাশগুপ্ত বলেছেন-

> "সংকটাপন্ন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। ব্যক্তির সর্বতোরকম স্বাধীন মানসিকতা অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।"[২]

বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন বর্ণনায় 'সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি' গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের জীবনচর্যায় চোখ রেখে চলে। এরকম সুজিত ও মিতু মধ্যবিত্ত স্বামী-স্ত্রী। সুজিতের অনেক শখ। নিজেদের বাড়ির বারান্দায় দেশি-বিদেশি ফুলের গাছ লাগায়। মালিকানা বজায় রেখে পরিচর্যার ভার চাপায় স্ত্রীর উপর। সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে কুকুর পোষে। রবিবারে আড্ডা দেয়, বউকে নিয়ে সিনেমা যায়, একমাত্র সন্তান টুবলুর পড়ার জন্য প্রাইভেট টিউটর দেয়, ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য না করে একরকম আভিজাতিক উদাসীনতা বজায় রাখে। মিতুর মনও আভিজাতিক পরিবেশ চায়। খোঁজ করে কাজের লোকের। তাদের ঘরে কাজের লোক লক্ষ্মীর উপস্থিতিকে বাণী বসু সযত্নে তুলে ধরেছেন।

ঘরে কাজের লোক রাখা আভিজাতিক লক্ষণ। তাই লক্ষ্মীকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা মিতু। রবিবার আড্ডা ফেরত সুজিতকে মিতু বলেছে তাড়াতাড়ি স্নান করতে। কারণ লক্ষ্মীর খিদে পেয়েছে। আড্ডা ফেরত সুজিত বাজার থেকে নানা রকম সবজি নিয়ে এলে তাকে শুনতে হয়েছে– "কেন গো লোক বলে সে বুঝি মানুষ নয়।"[৩] এক কথায় লক্ষ্মীর তোয়াজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

লক্ষ্মী টিভি-সিনেমা দেখার ঝোঁক নিয়ে এসেছে জগবন্ধু উকিলবাবুর বাড়ি থেকে। সে যেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সংযোগ সেতু। শুধু তাই নয় মধ্যবিত্তকে উচ্চবিত্তের জীবনচর্যার নেশায় অভ্যস্ত করতে চায় সে। উচ্চ-অভিজাত বাড়ির অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে সে কতগুলো দাবি পেশ করে-

(ক) ফ্লাস্ক-এর দাবি। শনিবার-রবিবার সিনেমা দেখার সময় তার চা করতে বিরক্ত লাগে। তাছাড়া লক্ষ্মী যেন চির সনাতন রীতির বিরোধিতা করে মিতুকে পরামর্শ দেয় বেলা চারটার মধ্যে সন্ধ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে।

(খ) দ্বিতীয় দাবিটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। সকালবেলা ভাতের সঙ্গে রুটি তৈরি করতে চাইছে। রাতে রুটি গুলি একটু গরম করলেই খাওয়া যাবে।

(গ) পরোক্ষে একটা দাবি পেশ করেছিল। উকিলবাবুর বাড়ির মতো রাত দশটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিও।

একমাত্র লক্ষ্মীকে ধরে রাখার জন্য মিতু তার বিবাহ বার্ষিকীতে 'একটা ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার' চায়। টুবলুকে নিয়ে সমস্যা হলে মিতু বলে-

> "'টুবলুকে না হয় টিউটোরিয়্যালে দিয়ে দাও। না-কিনলে বোধহয় লক্ষ্মীকে আর রাখা যাবে না' বলতে বলতে মিতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।"[৪]

মিতুর একথা পাঠককে গভীর চিন্তায় ফেলে দিতে পারে। মধ্যবিত্ত ও তাদের ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে দাঁড়ায়।

বাণী বসু এরকম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পাশাপাশি মিতুর দাদা-বৌদির পরিবারকে দেখিয়েছেন। লেখক দুই পরিবারকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছেন সময়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত কীভাবে প্রতিযোগিতা করে চলে। মিতু তাদের বাড়িতে আগত দাদা-বৌদিকে শোনায় তাদের সারা সপ্তাহের মাছ-মাংস আনা হয়েছে। তারা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে পরের দিনের রান্না করে রাখবে। মিতুর দাদা তাকে শোনায় মিতুর বউদির আটচল্লিশ ঘন্টা এগিয়ে থাকার বাতিকে তার পেটের বারোটা বেজে গেছে। মিতু বলেছে তাদের বাড়ির কাজের লোক টিভি দেখতে গেছে আরেক বাড়ি। লক্ষ্মী যে জগবন্ধু উকিলের বাড়ি চলে যায়নি এটাই মিতুর সৌভাগ্য। লোক থাকলেই তারা খুশি। মিতুর দাদা মধ্যবিত্তের অস্তিত্বকে ভালো করে অনুভব করেছেন। সুজিতকে বলেছেন–

> "এত দিনে এগজিসটেনশ্যালিজম কথাটার মানে পরিষ্কার হল সুজিত।"[৫]

মধ্যবিত্তের জীবন সংকটের গল্প 'সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি'। গল্পে মিতু ও সুজিত তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কিরকম জীবনচর্যার অভ্যাস করছে তা বোঝাতে লেখক 'পাঁচালি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'পাঁচালি' শব্দের অর্থ '(ব্যঙ্গে) বিরক্তিকর দীর্ঘ কাহিনি'।[৬]

'সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি' গল্পের পরিপূরক গল্প 'লক্ষ্মীর পদত্যাগ'। গল্পকার গল্পে সুজিত-মিতুর পরিবারে তথা তাদের জীবনের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন। সিদ্ধান্তটা ছিল 'জ্ঞানপাপী' লক্ষ্মীর বিদায়। কুফল জেনেও পানের সঙ্গে জর্দা চায়, ব্রত পার্বণে গোবিন্দভোগ চাল চায়- সবই যেন মেনে নেয় মিতু। মিতুর কথায় শ্রেণিসাম্য একটু প্রাধান্য পেলেও সুজিতের কথায় আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা। মধ্যবিত্ত কাজের লোকের দ্বারা 'ব্ল্যাকমেল' হচ্ছে। লক্ষ্মী 'মুচকি কেঁদে' মিতুকে আঘাত দেয়। বলে মিতু বিধবা হলে বুঝত নিরামিষ খাওয়ার কষ্ট। বিধবা সংস্কার বিষয়ে মিতুকে শুনতে হয়েছে তাদের মতো ম্লেচ্ছ বাড়িতে লক্ষ্মী থাকতে চায় না। এত অপমান সহ্য করতে না পেরে মিতু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়; লক্ষ্মীকে বিদায় জানায়। সুজিত মিতুকে বুঝিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি রমণীর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিয়েছে।

বাণী বসু বিশ্বায়ন ভাবনায় নারী-পুরুষের সাম্য তুলে ধরলেন। গৃহকর্ম শুধু নারীর নয় পুরুষেরও। মিতুর কথায় 'কিচেন রেভল্যুশন'। তাদের পরিবারে 'অনুজ্ঞার' পরিবর্তে 'কর্মকর্তৃবাচ্য' প্রাধান্য পায়। সেলিনা হোসেনের কথাঋণে বলা চলে বাণী বসু "নারী-পুরুষের একসঙ্গে বেঁচে থাকার মানবিক শ্রেয়বোধ"[৭]কে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। পরিচয় করিয়েছেন মানবিক অনুভূতি বিরোধী বিজ্ঞাপনী সংস্কৃতির আগ্রাসনের সঙ্গে।

লেখকের 'দাদারা' গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। তিনি 'যৌথ' শব্দটিকে দু'টি স্থানে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। (ক) পরিবারে, (খ) ফ্ল্যাটের হাউজিং এ। লেখক ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙ্গন দেখাতে গিয়ে সহোদর বড় দুই ভাইদের মূল্যবোধহীন আত্মকেন্দ্রিকতা ও ছোট ভাইয়ের প্রতি বঞ্চনাকে দেখিয়েছেন।

এজমালি জিনিস ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারে যেমন বাধা পায় ছোটভাই খোকনের স্ত্রী শম্পি তেমনি কাজের লোক বড় ও মেজর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ভুলে যায় তাদের কাজ করতে। ঘরে জলখাবারের ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয় খোকন। বাড়ি সরানোর বাড়তি খরচ কেউ দিতে চায় না। অথচ নেমন্তন্ন বাড়ির উপহারে সবার টাকা থাকলেও নাম থাকে শুধু দাদার।

যৌথ পরিবারের এরকম 'উঞ্ছ-নীচতা'য় অতিষ্ঠ হয়ে শম্পি বলেছে- "যৌথ পরিবারের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, আমি আর পারছি না, আমার দম আটকে আসছে।"[৮] পাঠক খেয়াল করতে পারেন 'ক্ষুর' শব্দটি ব্যবহার করে শম্পি যৌথ পরিবারের পাশবিকতাকেই বুঝিয়েছে।

নিজের ছেলেকে সমস্ত প্রকার নীচতা ও স্বার্থপরতা থেকে বাঁচানোর জন্য খোকন লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কেনে। গল্পকার কৌশলে দেখিয়েছেন এ যেন পারিবারিক যৌথ থেকে সমষ্টির যৌথে পদার্পণ। ফ্ল্যাটে এসে প্রোমোটারের বঞ্চনার শিকার হয়েছে খোকন। দলিলে গ্যারেজের কথা থাকলেও প্রোমোটার গ্যারেজ বিক্রি করে দিয়েছে ঝুনঝুনওয়ালাকে। অ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে সবাই সই-সাবুত করে খোকনকে গাড়ি রাখার জন্য একটি শেড তৈরি করতে বলে। পরে ঝুনঝুনওয়ালা আরো শেড তৈরি করতে চায় জানিয়ে কৌশলে চ্যাটার্জিদা শেড তুলিয়ে দেয়। এক সময়ে সেখানে দেখা যায় নতুন সাদা ফোর্ড আইকন; ব্যানার্জিদার গাড়ি। দাদারা কতরকম ভাবে ছোটদের ঠকায়, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করে তার দলিল এ গল্পটি। শম্পি বলেছে- "সব যৌথই হরে দরে এক।"[৯] লেখক আধুনিক দৃষ্টিতে একদিকে ক্ষয়িষ্ণু যৌথ অন্যদিকে বর্ধিষ্ণু যৌথকে দেখিয়েছেন। সবার মূলে রয়েছে বড়দের আগ্রাসন ও ছোটদের বঞ্চনা।

'হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' গল্পে বড় দাদার প্রতি অর্থবলে এগিয়ে থাকা ছোট ভাইয়ের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাশাপাশি আছে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল উর্ধ্বতন পদাধিকারীর প্রতি অধঃতন অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। পারিবারিক, সামাজিক অবিচার, অন্যায় ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে কিশোর মনের বিশ্লেষণ। বড় দুই দাদার পরিবারের অসম্পূর্ণতা, গোঁজামিল সেই পরিবারের বোন, গল্পের কথক সুবর্ণের দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে। সুবর্ণের স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, এক সন্তানকে নিয়ে দাদাদের পরিবারে তার নিরুপায় অবস্থান। মেজদা অসিতের ছেলে অমুর হারিয়ে যাওয়া ও চারদিন পর ফিরে আসাকে কেন্দ্রকরে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের মন-মেজাজ বিশ্লেষণ করতে বসেছে কথক। অমুর পলায়ন ও ফিরে আসা- এহেন আচরণের জন্য মেজদা ও মেজবৌদি মনে করে বড়দা ও বড়বৌদির সংস্পর্শই দায়ী। গল্পকার কিশোর মন ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার পাকানো জোট খোলার জন্য থানার ওসি এবং সাইকিয়াট্রিস্ট-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। একজন বাস্তব ঘটনার সত্যদর্শন ও অন্যজন কিশোর মানসে ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। আর সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষ্য গল্পের কথক সুবর্ণ।

থানার ওসি প্রতাপদার বন্ধু জানতে পারেন অমু আধাশহর জয়নগর, মেছুয়াপাড়া যায়নি, হুগলির দিকে গেছে, সঙ্গে কোনো সন্ন্যাসী ছিল না, মিথ্যা বলেছে। তিনি পরিবারের মানুষের কাছে জানতে চান অমুর কোনো পরিচয় কিংবা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল কিনা কিংবা পরিবারে 'ট্রমাটিক' কিছু ঘটেছে কিনা। কথক জানে মেজদার-মেজবউদির মনের ভিতরের টানাপোড়েন, তাদের মিথ্যাচার, আভিজাতিক অহংকার। বড়দার কথা না শুনলেও শেষে সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর চন্দ্রের কাছে নিয়ে যায়। বেশিরভাগ সময় কথক সুবর্ণ অমুর সঙ্গে যায়। মাস খানেক

পর ডক্টর চন্দ্র চিকিৎসার প্রয়োজনে কথকের ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করেন- কতদিন ধরে বাবার বাড়িতে রয়েছে, তার ছেলের অমুদের স্কুলে না পড়ার কারণ। ডক্টর চন্দ্র মনে করেন লোকটি সত্য, যার সঙ্গে অমু গিয়েছিল। তিনি কথককে এগারো বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ছবি দেখান।

কথকের স্বামীর সত্যতাকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন গল্পকার। অমু পিসেমশাই প্রতীক দত্তের সমস্ত ঘটনা জানে। জানে অধঃস্তন কর্মচারীদের দ্বারা প্রতারণার ঘটনা। জানে প্রতীক দত্তের বাড়ি থেকে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণ। অমু মনের গভীর থেকে ছবিটা এঁকেছিল। সমস্ত ঘটনার নির্যাস কথক আবিষ্কার করেছেন- দেখেছেন সবার মধ্যে পলায়ন প্রবৃত্তি কাজ করে। অমু কিশোর দৃষ্টিতে সমাজের চেহারা দেখে ভয়ে, বিতৃষ্ণায় পালিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। কথক বলেছে নিরুদ্দিষ্টদের ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যদি অমিতাংশুরা নিতো! বাণী বসুর গল্পে উচ্চবিত্ত অভিজাত জমিদারের উত্তরপুরুষদের মধ্যবিত্তে উত্তরণ দেখা যায়। উত্তরণ কেননা লেখকের কাছে সমস্ত সামাজিক বিত্তই পরম সমাদরের। জীবনের ব্যঞ্জনা মধুময়। জীবন মাধুরী তাঁর সাহিত্য সাধনার রসদ। উচ্চ অভিজাত জমিদারের উত্তর পুরুষদের উত্তরণের গল্প বলা চলে 'বাস্তু' ও 'জ্যোতির্ময়ী গুহ' কে।

'বাস্তু' গল্পের সূচনায় দেখা যায় রথীনের স্মার্ট ভাই ব্রতীনের ও ভগ্নিপতি বিমানের মুন্সিয়ানায় বাড়িটা শেষ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। পূর্বপুরুষের জমিদারি বাড়ির সঙ্গে রথীনের স্ত্রী জয়িতার আত্মিক যোগ। বাড়িটির স্থানে ফ্ল্যাট তৈরি হলে ব্রতীনের টাকার প্রয়োজন মিটবে ও রথীনের ভালো বাড়িও হবে।

ব্রতীন দাদাকে বুঝিয়েছে বউদিরা চিরকাল ভাড়াঘরে থেকেছে তাই বাড়ির প্রতি তার এত আকর্ষণ। শেষমেষ ব্রতীন নিজের অংশের ভ্যালুয়েশনটা চেয়ে বসেছে। চক্ষু লজ্জার ভয়ে ক্ষান্ত হলেও লাগিয়ে দিয়েছে ভগ্নীপতি বিমানকে। বিমান কৌশলে বউদি জয়িতাকে দেখায় বাড়ি গুলোতে সময়ের ছাপ, দেখায় ফ্ল্যাটের সুখস্বপ্ন। খুশি না হলেও জয়িতা বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়।

ব্যারাকপুর ছেড়ে তারা যখন উত্তর কলকাতায়, একদিন তাদের দশ বছরের ছেলে মিলু দেখেছে তাদের বোগেনভিলিয়ায় ছাওয়া বাড়িটা ছোট হয়ে হেঁটে হেঁটে তাদের কাছে এসেছে। জ্যোৎস্না রাতে জয়িতাও দেখেছে, রথীনও দেখেছে বাড়িটাকে। আসলে তাদের মনে ছেয়েছিল বাড়িটা। একদিন অফিস ফেরত রথীন জয়িতার কথা মতই বাড়ি দেখতে যায়। দেখে বাড়ির এক জায়গায় সুমো কুস্তিগীরের থাইয়ের মতো বোগেনভিলিয়ার শেকড় মাটি কামড়ে আছে। এ শেকড় যেন বোগেনভিলিয়ার নয়, তাদের বাড়ির শেকড়। গল্পে বাণী বসু দেখিয়েছেন বিশ্বায়নের যুগে অতীত কিভাবে ক্ষীণতর হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যায়, যার অবস্থান হয় মানুষের মনে একখন্ড সুন্দর স্মৃতি হিসেবে।

বাঙালি বালবিধবা পিসিমাদের অবস্থার পরিবর্তন 'জ্যোতির্ময়ী গুহ' গল্পে প্রাণময় করে তুলেছেন লেখক। জমিদার বংশের উত্তরপুরুষ বর্তমানে মধ্যবিত্ত সুরঞ্জন কর চৌধুরীর পিসিমার হঠাৎ আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

অজানা ফোনকলে সাড়া দিয়ে সুরঞ্জন কর চৌধুরী ৩/১ গুরুসদয় রোডের ঠিকানায় এসে দেখেন রিমডেল হওয়া সূর্যমহল বরজাতিয়াদের অধিকারে। সেনগুপ্তরা ভূতের ভয়ে বরজাতিয়াদের কাছে সূর্যমহল বিক্রি করেছে। ঘরের জঞ্জালের মধ্যে থেকে ভীষ্ম বরজাতিয়া পিসিমাকে আবিষ্কার করেছে। পিসিমার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাবির্ভাবে মধ্যবিত্ত সুরঞ্জনবাবু চিন্তায় পড়ে যান। চলৎশক্তিরোহিত পিসিমাকে কিভাবে নিয়ে যাবেন। তাদের দুটো মাত্র ঘর। কোথায় রাখবেন। খরচ কীভাবে চলবে। ফিরতি সুরঞ্জনবাবু পিসিমাকে নিয়ে যেতে চাইলে ভীষ্ম

বরজাতিয়া বলেছেন-পিসিমা সেই বাড়ির আত্মা, কোথাও যাবেন না। লেখক এখানে ছকেবাঁধা বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সম্পর্কসূত্রগুলো কিভাবে অদৃশ্য হচ্ছে তাও দেখিয়েছেন।

গল্পকার 'ধোঁয়া' গল্পে একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষকের জীবনের ইতিবৃত্ত ধরেছেন। একজন সফল ছাত্রের সামনে শিক্ষকের ছাত্র পেটানোর কারণ দেখিয়েছেন। ছাত্র শিক্ষকের বাড়িতে পৌঁছানোর পর ছাত্র-শিক্ষকের মাঝের সমস্ত ধোঁয়া সরে যায়।

বিপ্লব ঘোষ জজসাহেব। সওয়াল জবাব চলার সময় রামগতিবাবুর আবির্ভাবে চমকে ওঠেন। লাঞ্চ আওয়ারে অতীতের স্মৃতির পাতা খুলে বসেন। স্কুলে শিক্ষকদের মারের লিস্ট, ঠেঙারে শিক্ষকদের লিস্ট তাঁর মনে আসে। জগৎপতি হাই স্কুলের অঙ্কের মাস্টার রামগতি, ছাত্রদের দেওয়া নাম 'যমগতি' ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঠেঙারে। তিনি বিপ্লব ঘোষের টিউশন টিচারও ছিলেন। তাঁরই দৌলতে বিপ্লব ঘোষ লেটার পেয়েছিলেন। রামগতিবাবুর ইনক্রিমেন্টের টাকার ঝামেলা মিটলে পরে তিনি বিপ্লব ঘোষকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান। বিপ্লব ঘোষ মধ্যবিত্ত শিক্ষকের কোনোরকমে বেঁচে থাকার সংগ্রাম-চিত্র দেখেন।

গল্পের শেষে বাণী বসু 'ধোঁয়া' শব্দটিকে ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলেছেন। এ 'ধোঁয়া' মধ্যবিত্ত শিক্ষকের জীবন সংগ্রামকে দৃষ্টির বাইরে রাখার পর্দা মাত্র। রামগতিবাবুর স্কুলে ক্ষেপে যাওয়া, ছাত্র পেটানোর কারণ সকলের দৃষ্টির বাইরে রেখেছিল 'ধোঁয়া'।

সীমাহীন অর্থ উপার্জন ও উচ্চ জীবনশৈলীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, ভোগবাদী মানসিকতা মধ্যবিত্ত বাঙালিকে যে অবস্থায় ফেলে তারই পরিণতির গল্প 'লোনা'। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অনিরুদ্ধ বিজ্ঞাপন বা পণ্যবাজারের নেশায় মাতোয়ারা। নিজের স্ত্রী দীপাকে 'বালিকা বিদ্যালয়ের মাস্টারনি' বলে অপমান করতে দ্বিধা করে না। বাবা পার্থসারথি, মা সুচেতা এমনকি বাড়ির কর্ত্রীর প্রতি সে কৃতজ্ঞতা দেখায় না। স্ত্রীর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকা, বাবা-মায়ের পাঁচশো টাকার ভাড়া বাড়িতে থাকা- সবকিছু তার কাছে 'মধ্যবিত্তমি'। তার কাছে ঘৃণার। অনিরুদ্ধ বয়স ত্রিশ পার হওয়ার আগে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। চাকরি ছাড়ে চাকরি ধরে, গাড়ির পরে গাড়ি কেনে, সবই লোন নিয়ে। এরকম জীবন উপভোগে স্ত্রী দীপাকেও অভ্যস্ত করে তোলে। একদিন মার্কিন কোম্পানি থেকে ছাঁটাই হওয়া, শেয়ার মার্কেটের অধঃপতন তাকে অস্থির করে তোলে। এল আই সির মোটা টাকা ইনশিয়োরেন্স আছে বলে নতুন গাড়িটি নিয়ে নির্মীয়মান উড়ালপুলের পিলারে ধাক্কা মারে। সরেজমিনে তদন্ত করে এল আই সি কোম্পানি জানতে পেরেছিল সেটা আত্মহত্যা।

এল আই সির কাগজটা খুঁজতে গিয়ে দীপা ও পার্থসারথিবাবু একটি চিঠি পান। যেখানে অস্থির মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেনা শোধ করেও দেনা থাকে। একমাত্র মেয়ে অনামিকাকে নিয়ে দীপা পুরনো প্রাইভেট স্কুলে তিন হাজার টাকার চাকরি নিয়েছে। পেনশনের টাকায় কিছু হয় না বলে পার্থসারথি ট্যুইশন নিয়েছেন। গল্পের শেষ কথা- "বুড়ো হচ্ছেন পার্থসারথি, বুড়ো হচ্ছেন সুচেতা, বুড়িয়ে যাচ্ছে দীপা। বড়ো হচ্ছে অনামিকা। গৃধ্ন পৃথিবীতে।"[১০]

গল্পের নাম শব্দ 'লোনা'র অর্থ লবণাক্ত। যা প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে নির্দেশ করে। লোনা দেয়ালে ধরলে দেয়ালের যেমন অবস্থা হয় তেমনি এই গল্পে মধ্যবিত্তের অবস্থা। গল্পের শেষে ব্যবহৃত 'গৃধ্ন' শব্দটিও লক্ষনীয়, যার অর্থ লোভী বা লোলুপ।

গল্পকার 'লোনা' গল্পটিতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মধ্যবিত্তকে দেখিয়েছেন। উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে মানুষ বিজ্ঞাপন ও শেয়ার মার্কেটের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। শুভলক্ষ্মী দাশগুপ্তের কথা ঋণে বলা যায়-

> "বিলাস ব্যসনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষন মানুষকে আগ্রাসী করে তুলেছে। বিলাস ও প্রয়োজনের সূক্ষ্ম ভেদরেখা বিলীন হয়ে গেলে মানুষের নৈতিক আদর্শ মূল্যবোধহীন হয়ে পড়ে।"[১১]

বাণী বসু প্রবহমান জীবনকথা বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পে উঠে আসা মধ্যবিত্তের জীবন অনন্যতার দাবী রাখে। কথনশৈলী, ঘটনা নির্বাচন, মধ্যবিত্তের মনোলোকে বিচরণ, সবকিছুতেই তিনি শৈল্পিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ছোটগল্প সময়ের শিল্প এবং জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই বিশ্বাসবোধ থেকে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো উঠে এসেছে। সমস্ত সামাজিক বিত্ত তাঁর লেখনীতে পরম সমাদর লাভ করেছে। তপোধীর ভট্টাচার্যের কথায় বলা যায়-

> "জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই আশ্চর্যজনকভাবে শিল্পে রূপান্তরিত হয়।...সময় যত সূক্ষ্ম ও জটিলভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে দেখছি তার স্বীকৃতি।"[১২]

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। তৃতীয় খণ্ড, আস্বাদন- বারিদবরণ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৯।

২. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পা.)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ/ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১২১৪।

৩. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৩, পৃ. ৪।

৪. তদেব, পৃ. ৮।

৫. তদেব, পৃ. ৯।

৬. সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, বিংশতিতম মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫০৭।

৭. মণ্ডল, বরেন্দু (সম্পা.)। নারীবিশ্ব। সেলিনা হোসেন, অভিজান পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯ প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬।

৮. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২১, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৮৩।

৯. তদেব, পৃ. ২৮৭।

১০. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৫, পৃ. ৩১৫।

১১. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার সমরেশ (সম্পা.)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ / দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১২১৩।

১২. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্প: সময়ের শিল্প, এবং মুশায়েরা। কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪২৩ পৃ. ৩৪।